অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 27-35
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.004

JIBANANANDER DITIYO PARJAYER KABYE SAMAYCHETANA / জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যে সময়চেতনা (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ—১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

ANSHUMAN KHAN / অংশুমান খাঁন
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email: anshumankhan94@gmail.com

Accepted: 02.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: জীবনানন্দ, ধূসর পাণ্ডুলিপি, মহাপৃথিবী, বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির, সজনীকান্ত, সমর সেন, নিরুক্ত, নীরেন্দ্রনাথ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, রিল্‌কে, হপকিন্স, আলোক সরকার, সময়চেতনা, পরিচয়, কবিতা

Abstract:
১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ—১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনে এই সময়পর্বটি সব থেকে ফলবতী। তিনি এই পর্বের বেশিরভাগ সময় কাব্যচর্চার মধ্যেই অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টির অধিকাংশ এই সময়েই রচিত। শুধু পরিমাণের দিক থেকে নয় কাব্যমূল্যের দিক থেকেও এই সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জীবনানন্দ দাশের কাব্যে যে পরিণতিবোধ দেখতে পাই তা আসলে এই সময়পর্বেই গঠিত। তাঁর ব্যক্তিজীবনের দিকে তাকালেও দেখা যাবে এই সময় তিনি একটু স্থির হতে পেরেছিলেন জীবনে। এই পর্বের অধিকাংশ সময়ই তাঁর বরিশালে কেটেছিল। কিন্তু কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁর কাব্য সেকথাই বলে। তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে তা এই সময়পর্বে রচিত কাব্যের ক্ষেত্রেই। বাংলার গ্রামজীবন ও ইন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পের পরিবর্তে অনুভূতির প্রগাঢ় জগৎ থেকে তিনি চিত্রকল্প সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই কবিতাগুলি জটিল বলে মনে হতে লাগল। আসলে সময়ের চিহ্নকে ধারণ করে থাকার ফলে কবিতাগুলি পাঠকের কাছ থেকে যে পরিমাণ মনোযোগ চেয়েছিল তা দেওয়া সব সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু সাধারণ পাঠক নয় সজনীকান্ত দাস, সমর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো কবি-সমালোচকেরাও জীবনানন্দের কবিতার দিকে আঙুল তুলেছেন। জীবনানন্দ কখনও প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কখনও দেননি। কিন্তু সাহিত্যচর্চায় নিজের কক্ষ থেকে কখনও চ্যুত হননি।

Discussion:

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দ দাশ টিউটর হিসেবে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যোগ দেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেকচারার পদে উন্নীত হন। এই সময় *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হলে জীবনানন্দের কবিত্ব নিয়ে গুণী পাঠকের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। অবশ্য জীবনানন্দের এই কাব্যে সময়ের ছাপ সরাসরিভাবে নেই। যা তৎকালীন কাব্যচর্চার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। ফলে অনেকের কাছেই এই কাব্যটি 'সময়ছাপহীন' বলে মনে হয়েছিল। সমর সেন (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ) *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের প্রশংসা করলেও কিছু জায়গায় তিনি এই 'পলায়নী মনোবৃত্তি' লক্ষ করেছিলেন এবং কবির এই পলায়নী বিধানে অনেকেই অস্বাছন্দ্য বোধ করবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন— "But there is something more than this in an enduring work of art, it also has a social content. And men who are sceptical about the flattering, poetic view of poetry will perhaps be irritated by the escape-formula worked out in the last poem of *Dhusar Pandulipi*, the dream-cult and the rest of it. Today we are all bound upon a wheel of fire, and there is stronger temper in the air. We cannot possibly step aside, and retreat to an ivory tower."[১] অবশ্য এই আলোচনায় একটি বিশেষ তথ্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। জীবনানন্দ নিজে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের ভূমিকায় এই তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। ফলে জীবনানন্দের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেমন এখানে প্রকাশিত তেমনই এই পর্বে তাঁর পরিণত মনস্কতার কিছু অভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এতৎসত্ত্বেও তাঁর কবিসত্ত্বার প্রকাশটিকে চিহ্নিত করা এই কাব্যের মাধ্যমে কষ্টসাধ্য নয়। এবং এই কাব্যের অনেক স্থানেই জীবনানন্দ তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে এই উত্তাল সময়ের চিহ্নকে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি মানুষের জীবন সময়ের অভিঘাতে কীভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা তাঁর এই কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এইসময় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুনরায় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে বিদেশের মাটিতে ভারতের বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টার অন্যতম নেতৃস্থানীয় মুখ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময় বাংলা বিভাগে ছিলেন হেরম্বকুমার চক্রবর্তী, সুধাংশুভূষণ চৌধুরী প্রমুখ। রসায়ন বিভাগে ছিলেন রমেশচন্দ্র সেন। যিনি সজনীকান্ত দাসের (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হেরম্বকুমার চক্রবর্তী ও রমেশচন্দ্র সেন জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে প্রসন্ন ছিলেন না, প্রকাশ্যেই নানা রঙ্গব্যঙ্গ করতেন। ফলে স্ব-স্থানে ফিরেও জীবনানন্দ খুব বেশি স্বস্তি পাননি। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর একটি দূরত্ব বরাবরই বজায় ছিল। ছাত্রদের কাছেও তিনি ছিলেন 'আত্মকেন্দ্রিক'। কলেজে সহকর্মীদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন না হওয়ার একটি কারণ অনুমান করা সম্ভব। *পরিচয়* পত্রিকায় 'ক্যাম্পে' (মাঘ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) কবিতা প্রকাশের পর এই কবিতাকে কেন্দ্র করে সজনীকান্ত দাস জীবনানন্দের প্রতি খড়্গহস্ত হন। তারপর হঠাৎ করেই বড়ো পত্রিকাগুলি জীবনানন্দকে ব্রাত্য করে দেন। এর কারণ জীবনানন্দ বুঝে উঠতে পারেননি। 'ক্যাম্পে' কবিতাকে কেন্দ্র করে যে বিবাদ গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে তিনি নিজে খুব বিচলিত ছিলেন না। তিনি এই অভিযোগের একটি উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। একটি লেখাও তৈরি করেছিলেন কিন্তু তা তখন প্রকাশিত হয়নি।[২] সেই লেখা পড়লে বোঝা যায় জীবনানন্দ নিজের সৃষ্টির প্রতি অবিচল ছিলেন। হরিণীকে ঘাই করে পুরুষ হরিণদের নিয়তির মুখে টেনে আনার এই চিত্রকল্প ছাড়াও অসতর্ক নিশান্ত মুহূর্তে শিকারি কীভাবে হরিণকে লক্ষ্যভেদ ক'রে তার ভোজ্যের আয়োজন করে তা নিয়েও তিনি দু-একটি কবিতা

লিখেছেন। তাঁর কাছে 'ক্যাম্পে'-র সুর আসলে নিরাশ্রয়তার সুর। তাঁর এই সময়ের আরও কয়েকটি রচনায় জঙ্গল বা জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্প ফেলে থাকার প্রসঙ্গ এসেছিল। ফলে এই কবিতার আবহ এবং তার নির্মাণ দুটিই স্বতঃপ্রণোদিত। আর অশ্লীলতার যে অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন তা যে কেবলই পাঠের সীমাবদ্ধতা তা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সমালোচনার উত্তরের মাধ্যমে। কিন্তু এই অভিযোগ এতটা গুরুতর হয়ে উঠবে তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। বাঙালি পাঠক সমাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলেও বড়ো পত্রিকাগুলি এভাবে তাঁর কবিতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। সজনীকান্ত পরবর্তীকালেও জীবনানন্দকে নানাসময়ে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। যেমন *নিরুক্ত* পত্রিকায় প্রকাশিত শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেমালাপ' সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে জীবনানন্দকে অশ্লীলতার দায়ে কদর্যভাবে দগ্ধ করেছেন।[৩] অবশ্য শুধু জীবনানন্দের কাব্যের ক্ষেত্রেই নয় তরুণ লেখকদের অনেককেই এই অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তরুণদের সাহিত্যে অশ্লীলতার রূপ দেখে আহত হয়েছিলেন।

এই সময়পর্বে জীবনানন্দ *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করেন। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যে যে ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছিল এখানে তেমন প্রয়োগ থাকলেও তার সঙ্গে এক নতুন পদ্ধতিরও দেখা মেলে। ফলে কবিতার বক্তব্য ও সুর দুইয়েরই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র সময়ের কবিতার আবেদন ছিল মূলত আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে এবং তা বিলম্বিত লয়ে উপস্থিত হত। কিন্তু এই পর্বের কবিতা আমাদের চিন্তাশক্তিতে আঘাত করতে চায়। এখানে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে তারও চরিত্রগত পরিবর্তন হয়েছে। চিত্রকল্প আর পূর্বের মতো প্রাকৃতিক বা শারীরিক নয় তা হয়ে উঠেছে নির্বস্তুক। ভাষার ব্যবহার আরও সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। এই নির্বস্তুক চেতনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এই পর্বের কবিতার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। জীবনানন্দ তাঁর পূর্বের জগৎ থেকে আরও সরে এসেছেন। ফলে কোনো কোনো পাঠকের কাছে জীবনানন্দের কবিতা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। জীবনানন্দের এই জগৎ ব্যক্তিগত অনুভূতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠেনি। বরং ইতিহাস ও সময়ের দ্বারা তা নির্মিত হয়েছে। তবে সমসাময়িক কবিদের সৃষ্টিতে সময় যেমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ করেছে জীবনানন্দের কবিতায় সময়ের সেই প্রত্যক্ষ রূপ নেই। বরং তার একটি গভীর অভিঘাত রয়েছে। সেই আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছে তাঁর চেতনা। তাঁর আপাত-রোমান্টিক সত্তা থেকে তিনি সরে এসেছেন, যদিও তাঁর কবিতা এখনও অত্যন্ত রোমান্টিক। এখানেও বিষাদের কারণ বর্তমান কিন্তু এই বিষাদের কারণ আর ব্যক্তিগত নয়। জীবনানন্দ সমকালীন ইতিহাস নিয়ে উচ্চকিত ছিলেন না; ইতিহাস সচেতনতা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভিন্নভাবে। সমর সেন যে 'পলায়নীবৃত্তি' খুঁজে পেয়েছিলেন *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র সময়ে তা এইসময় মুছে গিয়েছিল। তিনি মৃত্যু বা অবক্ষয় সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। কখনো-কখনো মনে হয় মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর একটি বিকৃত প্রেম রয়েছে। শোকগাথার জগৎ থেকে তিনি মৃত নারীর মূর্তি নির্মাণ করেন। তাঁর প্রেমিকারা প্রায়ই মৃত বা প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। তারা তাদের রূপ নিয়ে কবির থেকে, এই জগৎ থেকে দূরে চলে যায়। তাদের এই চলে যাওয়া আসলে সুসময়ের যাত্রা। সময়ের অবক্ষয়ই তাদের চলে যেতে বাধ্য করে। এই পৃথিবী তাদের আর পায় না। এই যাত্রার মধ্যে রোমান্টিকতা থাকলেও তা ইতিহাসের অভিঘাতকেই প্রকাশ করে। কবি নিজে ইতিহাস ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে নিরাশায় উদ্বেলিত হয়েছিলেন তারই প্রকাশ ঘটেছে এই পর্বে। 'ফুটপাথে' কবিতাটিকে এই যাত্রার একটি বিশেষ বাঁক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখানে এই নতুন সুরটি শোনা যায়। এই কবিতার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল কবিতা নির্মিত হয়েছিল তারমধ্যে কয়েকটি হল— 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'নিরালোক', 'সিন্ধুসারস', 'ঘাস', 'হাওয়ার

রাত', 'শ্রাবণরাত', 'আমি যদি হতাম', 'হায় চিল', 'বুনো হাঁস', 'শঙ্খমালা', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'শব', 'হরিণেরা', 'স্বপ্ন', 'বিড়াল', 'আট বছর আগের একদিন', 'শীতরাত', 'আদিম দেবতারা', 'স্থবির-যৌবন', 'আজকের এক মুহূর্ত' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কিছু কবিতা *বনলতা সেন* (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যে প্রকাশিত, কিছু স্থান পেয়েছে *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যে। জীবনানন্দের যে মূর্তি পাঠক সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল তা এই কবিতাগুলির সুবাদেই। এই কবিতাগুলির মধ্যে বহুস্বর থাকলেও একটি বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই কবিতাগুলির নায়ক জীবনানন্দের কবি-মানস। তাঁরই মানসিক, আত্মিক নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখানে প্রতিফলিত। প্রেম, মৃত্যু, প্রকৃতি এখানে কবির চিন্তাকে দখল করে রেখেছে। কিন্তু বাংলার গ্রামজীবন ও ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প দিয়েই এই কবিতাগুলির শরীর নির্মিত। জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে তৎকালীন এই ভাবনাই প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর কবিতার মূল সুর হিসেবে তাঁরা এটিকেই চিহ্নিত করেছিলেন। অবশ্য পাঠক-সমালোচকেরা জীবনানন্দকেই এই কবিতাগুলির নায়ক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। জীবনানন্দ তাঁর এই গড়ে ওঠা কল্পিত মূর্তি ভেঙে ফেললেন পরবর্তী কবিতাগুলিতে। এখানে চিত্রকল্প সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমত নৈসর্গিক জগৎ থেকে, দ্বিতীয়ত দৈহিক অনুভূতির প্রগাঢ় জগৎ থেকে। আমরা পূর্বে বলেছি জীবনানন্দের এই পর্বের কবিতায় পলায়নী মনোবৃত্তি নেই, কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভিড়, নোংরা ও ব্যস্ততায় ভরা যে শহরে তিনি বসবাস করেন সেই শহরের বাহ্যিক চিহ্ন এই কবিতাগুলির শরীরে নেই। তিনি শহরের এই রূপকে যে অগ্রাহ্য করছেন তা নয় কিন্তু নাগরিক জীবনের বিক্ষুব্ধ চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য শহরের এই রূপ কবিতায় চিত্রিত করা অনিবার্য বলে মনে করছেন না। তাই তাঁর কাব্য পাঠ করলে মনে হবে তিনি কোনো চিরগোধূলি দেশের মানুষ। কবি নিজে পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত হলেও কবিতায় সেই ব্যথার চিত্র নেই। ভাঙা-গড়ার প্রতীক হিসেবে এই কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কবি, সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ — ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ) জীবনানন্দের কাব্যে 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' খুঁজে পেয়েছিলেন।[৪] এবং তিনি তাঁর এই মন্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটিকে বেছে নিয়েছিলেন। এই কবিতাটি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নীরেন্দ্রনাথের এই সমালোচনা জীবনানন্দের পছন্দ হয়নি। তাঁর মতে, 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' কোনোদিনই তাঁর কবিতার প্রধান আবহাওয়া ছিল না। তাছাড়া তাঁর এই কবিতা subjective নয়, তাঁর ভাবনার dramatic representation। এই প্রসঙ্গে তিনি *Hamlet* (১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ), *Lear* (১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ) বা *Macbeth* (১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ)-এর 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'-র সঙ্গে শেকসপিয়রের (১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ — ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি objective দৃষ্টিতে তাঁর এই কবিতাকে দেখতে চেয়েছেন। কবিতাটির শেষে subjevctive note থাকলেও তা লাশকাটা ঘরের ক্লান্তি থেকে অনেক দূরে প্রকৃতি, ইতিহাস ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে সম্পৃক্ত কবিকে স্মরণ করায়। ফলে কবিতার নায়কের সঙ্গে তার স্রষ্টাকে একাত্ম করে না দেখলেই কবিতাটির নির্ভুল মূল্যায়ন হবে বলে কবির অভিমত। এছাড়াও কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন 'আট বছর আগের একদিন' জীবনানন্দের বহু চর্চিত কবিতাগুলির একটি হলেও তা জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কথিত 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' থেকে মুক্তি পেতে গেলে শুধু 'আশাবাদী মনোভাব' দিয়ে তা সম্ভব নয়। জোর করে আরোপিত আশাবাদ দিয়ে শিশুকে ভোলানো গেলেও তা স্বাভাবিক ও সর্বজনীন নয়। এখানে আমরা জীবনানন্দ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কে যে একটি ভিন্ন অবস্থান রয়েছে তা বুঝতে পারছি। শুধু আশাবাদ আরোপিত করে কয়েকটি সহজ লাইন নির্মাণ করলেই যে কবিতা হয় না, বা কাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ

হয় না তা জীবনানন্দের বিশ্বাস। তিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সমাজের যে ভাঙন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা সাধারণ নয়। তার গভীরতা মানব সমাজকে একটি বিশেষ স্থানে এসে দাঁড় করিয়েছে। সেখান থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য একটি সার্বিক উন্নতি প্রয়োজন। কোনো একক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা বা আশাবাদ দিয়ে এই পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এছাড়া তাঁর আর একটি যুক্তি হল, কবিতায় তিনি 'আমি' ব্যবহার করেছেন নিজেকে বোঝাতে নয়; ব্যক্তিগত সত্তার পরিবর্তে কবি-মানসে সময়, সমাজ যেভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা এই 'আমি'। কিন্তু আধুনিক কাব্য পড়ার সময় পাঠক বা সমালোচক এই কথা প্রায়শই ভুলে যান। ফলে কবিতার নায়কের সঙ্গে কবিকে তাঁরা একাত্ম করে ফেলবেন এতে আর আশ্চর্য কী! কবি নিজে বিজ্ঞানকে ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির ভেতর দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলেই কবিতা আশাবাদের প্রতীক হয়ে উঠবে এমন সিদ্ধান্তে জীবনানন্দ বিশ্বাসী নন। বরং তিনি কবিতার মধ্যে সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উৎসারণ চান যা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সেক্ষেত্রে নিরাশাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কাব্যও এমন উজ্জ্বল ও আন্তরিক হয়ে উঠতে পারে যা আশাবাদের কবিতা বলে গণ্য হবে। জীবনানন্দ শব্দের সাধারণ অর্থের চেয়ে তার বিশিষ্ট অর্থের প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করতেন। 'আশাবাদ', 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি' প্রভৃতি শব্দের বাজারি অর্থ অতিক্রম করে তাদের বিশিষ্ট অর্থে গ্রহণ করেছেন তিনি।

সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থটি কিছুটা ভিন্ন মেজাজের। এই কাব্যের কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি সচেতন অভিনিবেশ লক্ষ করা যায়। কবিতাগুলি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হলেও এগুলির পটভূমিকায় একটি নৈকট্য রয়েছে। বিবিধ স্বতন্ত্র মনোভাব কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকেই যেন অগ্রসর হচ্ছে। আবহমান সময়ের এই শূন্যতা ও প্রাণধর্মের অর্থহীন যাত্রাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে এই কাব্য। কবি, সমালোচক আলোক সরকার (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ—২০১৬ খ্রিস্টাব্দ) এই কাব্যে প্রত্যক্ষত তিনটি স্বতন্ত্র মনোভাবের খোঁজ পেয়েছেন—"*সাতটি তারার তিমির*-এ কিছু কবিতা আছে যাকে বলা যেতে পারে আবহমান সময়-চেতনার কবিতা। যে চেতনায় একীভূত অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ভিতরে মানুষের সকল প্রয়াস উৎকাঙ্ক্ষা, তার পরিণামও এক অনড় অনতিক্রম স্থিরতা, সেখানে যেমন কোনো অগ্রগমন নেই সেইরকম পশ্চাদ্‌প্রস্থান, যাকে আদিমও বলা যাবে না, অধুনাও। আবহমান নিরুদ্ধ সময়, আবহমান মানুষ, তাৎপর্যহীন আবর্তন, কেবল একটি কেন্দ্র, আর অর্থহীন প্রবহমানতা। 'সাতটি তারার তিমিরে' আর এক চরিত্রের কবিতা আছে যা ব্যঙ্গপ্রবণ। সেই ব্যঙ্গের সঙ্গে কখনো মিলেছে কৌতুক, যে কৌতুক যে ব্যঙ্গপ্রবণতা আর এক ধরনের তাৎপর্যহীন অর্থহীনতাকে কেন্দ্র করেছে, ঘোষণা করেছে তথাকথিত আধুনিকতা, শিক্ষা প্রগতির উপর, তথাকথিত মানব-বিবর্তনের উপর কঠিন রক্তিম যন্ত্রণাবিদ্ধ অনাস্থা। এই ধরনের কবিতাগুলিকে বলা যেতে পারে তমোবর্ণ কবিতা, যে তমসা শানিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের বিদ্যুতে বারবার ক্ষতবিক্ষত। 'সাতটি তারার তিমিরে' আর এক ধরনের কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা পূর্ববর্তী দুটি প্রতিন্যাসকেই প্রতিবাদ করতে চেয়েছে; বলা ভালো অতিক্রম করতে চেয়েছে। সেই চাওয়া কতোটা নিবিড় বিশ্বাস-সঞ্জাত তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু তার আন্তরিকতায় সন্দেহ নেই। তবু, আমরা তাকে এখনো কোনো উজ্জীবনী বিভাসের কবিতা বলতে পারব না, *বেলা অবেলা কালবেলা*-র অনেক কবিতার প্রসঙ্গেই যা সহজে পারব।"[৫]

জীবনানন্দের পূর্বে সময়-চেতনার সঙ্গে জীবনানন্দের এই কাব্যের সময়-চেতনার একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও আমরা সময়-চেতনার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু সেখানে অতীতের মানুষের সঙ্গে বর্তমানের

মানুষের অনুভূতির অভিন্নতা ছিল। দুজনেরই ছিল এক সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু জীবনানন্দের সময়-চেতনায় তা নেই। এখানে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটি ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এই দৃষ্টি সদর্থক নয়। এখানে বেঁচে থাকা মানে শুধু জৈবিক প্রয়োজন মেটানো। যা আদিমকালেও ছিল। ফলে এখানে সময়-চেতনা একটি অবক্ষয়কে প্রকাশ করে। *সাতটি তারার তিমির* কাব্যের কিছু কবিতায় নিউটনীয় যান্ত্রিক বিজ্ঞানদর্শনের সরাসরি প্রভাব রয়েছে। তিনি বিজ্ঞান থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু এই গ্রহণ শুধু বাহ্যিক নয়। তিনি বিজ্ঞানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাহায্যে মানব সভ্যতা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না তা তিনি জানতেন। তাই তিনি বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর কবিতার শরীরকে আমূল বদলে ফেলেননি। বরং বিজ্ঞান তাঁর কবিতার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। তিনি প্রকৃতিকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করতে চাননি বিজ্ঞানের সাহায্যে। বরং প্রকৃতির মধ্যেকার অনন্ত রহস্যময়তাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফলে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটি স্বাভাবিক মিলন ঘটেছিল তাঁর কাব্যে। তাঁর কাব্য এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদিব্যতার দ্বারা কীভাবে আরও বড়ো চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে তা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভাকরকে সেনকে লেখা একটি পত্রে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

কাব্যচর্চার সূচনালগ্ন থেকেই জীবনানন্দ কবিতারচনাকে শুধু কবিহৃদয়ের একটি দিব্যমুহূর্তের উদ্ভাস হিসেবে দেখেননি। কল্পনাপ্রতিভার সঙ্গে জীবন-অভিজ্ঞতার অর্জন বা চিন্তনের মিলন না ঘটলে সেই কবিতার আবেদন শুধু হৃদয়ের কাছেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কবির মুখ্য কাজ যদি হয় নিজের অভিজ্ঞতা বা ভাবকে পাঠকের অভিজ্ঞতা করে তোলা তাহলে অনিবার্যভাবেই 'communication of ideas'-এর প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। জীবনানন্দ কবিতাসৃষ্টি প্রসঙ্গে 'প্রেরণা' শব্দটির প্রচুর অপব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত ছিল। তবু শব্দটির শুদ্ধতা ও সঙ্গতি যে নষ্ট হওয়ার নয় সেই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি জানতেন নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়। আরও কিছু প্রয়োজন। এবং সে-সবের সম্মিলিত শৃঙ্খল থেকেই প্রেরণার জন্ম। তাই তিনি কবিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির অভিজ্ঞতাকে 'পরার্থপর' করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি 'মাত্রাচেতনা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এবং কবিতার অস্পষ্টতার পেছনে যে যুগের অস্পষ্টতা ও ইতিহাসের অন্তঃসার শূন্যতাই দায়ী তা মনে করতেন। এই পর্বে জীবনানন্দের কবিতায় দর্শন আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। সময়-সংকট আরও নিবিড় হয়ে উঠেছিল এই কবিতাগুলিতে। কিন্তু এই কবিতাগুলির মধ্যে এক অন্তর্নিহিত আশার সুর লক্ষ করা যায়। 'রিস্টওয়াচ' কবিতায় যেমন শুনি—

> স্তিমিত—স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
> ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।[৬]

'তিমির' শব্দটি 'রৌদ্রের' পাশে বসে আপাত বৈপরীত্য সৃষ্টি করলেও যুদ্ধের প্রসঙ্গে এসেছে এই রৌদ্র-তিমির বৈপরীত্য। 'কামানের ক্ষোভে চূর্ণ' হয়েও মানব কোনোদিন হেরে যাবে না। এই আশা তাঁর কাব্যের কেন্দ্রে রয়েছে। কিন্তু এই সুর প্রকট হয়ে ওঠেনি। ফলে পাঠকের অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় যে তাঁর কবিতার মূল সুর তিমিরবিলাসী। এই কাব্যের অনেক কবিতার মধ্যেই যুদ্ধের পটভূমিতে নাগরিক জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে তার চিত্র রয়েছে। এই কবিতায় যে দৃশ্যটি চিত্রিত হয়েছে তা এইরকম—পাহাড়ের নীচে কামানে চূর্ণ হওয়া কিছু মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে চারদিকে। তাদের হাতে বাঁধা ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে, সময় চলমান। চাঁদের আলোতে এইসব মৃত মানুষ যেন প্রহরীর মতো শুয়ে আছে। এরা যেন পুরোপুরি মৃত নয়। কিছু প্রীতিকর বাসনা ছিল এদের হৃদ্‌যন্ত্রে। তাই এরা এখনও যেন কথা বলছে। তারার আলো সেবন করছে। যে জগতে মৃত

মানুষ জেগে উঠে কথা বলে সেখানে আলো-অন্ধকারের ব্যবধান মুছে যায়। এই পরাবাস্তব মুহূর্তকে সাধারণ বুদ্ধিতে অ্যাবসার্ড মনে হলেও আসলে স্পষ্টতা আর অস্পষ্টতার এই মিশ্রণেই বাস্তবকে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি যে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করাতে চেয়েছেন তা যুদ্ধবিধ্বস্ত 'অনন্ত তিমির' এই দেশ। তাঁর কবিতা এই সময়চেতনাকে বরাবর প্রাধান্য দিয়েছে। জীবনানন্দ নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন— "মহাবিশ্বালোকের ইসারার [ইশারার] থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ ক'রেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।"[৭] 'ঘোড়া' কবিতায় আমরা সময়চেতনার একটি শীর্ষরূপ আমাদের চোখে পড়ে। এখানে তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সময়চেতনাকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই সময়চেতনার বোধ ছাড়া vision-কে বাস্তব করে তোলা যায় না। গোল আস্তাবলের জীবন আসলে সময়বৃত্তে ঘূর্ণায়মান আমাদের জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। এই জীবনের আলো মোমের মতো ক্ষয়ে যাচ্ছে। প্রস্তরযুগ থেকে নিওলিথ বা নব্য প্রস্তরযুগেও চলমান ঘোড়াদের বিচরণ। ঘোড়াদের আস্তাবলে জীবনের আলো নিভল কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়েই; সেই 'কার্তিকের জ্যোৎস্না' যা বাস্তবকে প্রকাশিত করেছে ঘোড়াদের বিচরণ ও স্তব্ধতার (জীবন ও মৃত্যুর?) মাধ্যমে। 'বিষণ্ণ খড়' যা আজ ইস্পাতের কলে পেষাই হচ্ছে। নগর সভ্যতার বিস্তারে সংকুচিত হচ্ছে আস্তাবল। কবিতার একদম প্রথম চরণে 'তবু' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ প্রতীকধর্মী। 'আমরা' এই সর্বনাম দিয়ে কবি তাঁর একার দর্শন বা উপলব্ধিকে সকলের দৃশ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কবিতার জীবনানন্দকে হপকিন্সের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন। তাঁর মতে, "Vision-এর অতুলনীয় প্রতিভা নিয়ে অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন হপকিন্স যেমনি বহির্জগতে vision-কে অভিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন এবং দেশ-কালের সম্পর্কে vision-এর দৃষ্ট বস্তুর (দৃশ্যের) সারাৎসার স্থাপন করে অনুভব করতে চেয়েছিলেন যে নিজের কবিতায় তা প্রকাশ করতে পারছেন,—অন্তত 'ঘোড়া' কবিতায় জীবনানন্দ তা-ই করেছেন।"[৮] ঘোড়ার পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতাকে আমরা চেতনাপ্রবাহ বা Stream of Consciousness হিসেবে দেখতে পারি। এই কবিতা আমাদের রিল্‌কের 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট'-এর বিশ সংখ্যক কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে তিনি বলেন—

The remembered evening of one spring day,
in Russia: a horse drawing near...
White coming up from the village alone,
on one fetlock a tethering-block,
to spend the night alone, on his own.[৯]

বুদ্ধদেব বসু এই কবিতার অনুবাদ করেছেন এভাবে—

অবিস্মৃত একটি বসন্তদিন—রাশিয়ায়—আসন্ন সন্ধ্যার
অন্ধকার গ্রাম ছেড়ে চলে আসে আমাদের দিকে
একটি ধবল ঘোড়া, নিঃসঙ্গ ...এর পায়ে কাষ্ঠখণ্ড বাঁধা,
তবু রাত কাটাতে চায় সে একা, জনশূন্য মাঠে—[১০]

রিল্‌কে ওই নিঃসঙ্গ সাদা ঘোড়ার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন আবহমান কালকে খুঁজে পেয়েছিলেন, জীবনানন্দও ঘোড়াদের মধ্যে প্রস্তরযুগকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তার নিওলিথ-স্তব্ধতা। কিন্তু দুজনের এই দেখার মধ্যে একটি প্রভেদ লক্ষ করা যায়। রিল্‌কের কবিতায় call of space-এর বার্তা এসেছিল ঘোড়াটির মধ্য দিয়ে কিন্তু

জীবনানন্দের কবিতায় এই call of space অর্থাৎ দেশকালের বহমানতা কবিকে তার অন্তর্গত করে নেয় যেখানে রিল্‌কের কবিতায় তা একটি বার্তা হিসেবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। জীবনানন্দের কবিতায় কবির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও ওই আবহমান সময়ের অন্তর্গত হয়ে যায়।

Reference:

১। ৪ জুলাই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে *The Sunday Amritabajar Patrika*-র 'Books and Reviews' বিভাগে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের সম্পূর্ণ নামের পরিবর্তে S.S. স্বাক্ষর ছিল। পরবর্তীকালে *সংকলিত সমর সেন* (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে 'Bengali Poems: Dhusar Pandulipi' নামে লেখাটি প্রকাশিত হয়।
২। পরবর্তীকালে ভাদ্র ১৩৮১ বঙ্গাব্দে *শতভিষা* পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়।
৩। কার্তিক ১৩৫০ বঙ্গাব্দে *শনিবারের চিঠি* পত্রিকার 'সংবাদ-সাহিত্য' অংশে এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের *নিরুক্ত* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'বন্ধনী' শিরোনামে জীবনানন্দের পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাটিও ওই একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে সজনীকান্ত দাস ভালো, প্রাঞ্জল কবিতার উদাহরণ হিসেবে শান্তিরঞ্জনের 'প্রেমালাপ'-এর প্রশংসা করার জন্য জীবনানন্দের কবিতার নিন্দা করা আবশ্যক বলে মনে করেছেন। শুধু তাই নয় *নিরুক্ত* পত্রিকা প্রথমে যে আদর্শের কথা প্রচার করেছিল এখন সেসব ভুলে শুধু 'আমিত্বের প্রসার' করে যাচ্ছে বলে তাঁর অভিমত। ফলে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর কোনো তফাত নেই। এই আক্রমণকে আরও তীক্ষ্ণ করার জন্য সজনীকান্ত দাস ইচ্ছে করেই জীবনানন্দের কবিতা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সিনেমার নামগুলি ব্যবহার করেছেন।
৪। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে *পূর্বাশা* পত্রিকায় রামেন্দ্র দেশমুখ্যের *ধানক্ষেত* কাব্যগ্রন্থের একটি অনামিত রিভিউ প্রকাশিত হয়। সেখানে লেখক মন্তব্য করেন— "মাঝে মাঝে জীবনানন্দ দাশের আত্মঘাতী ক্লান্তি থেকে তিনি মুক্ত। নারীর হৃদয়, শিশু, অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা—সব কিছুকে পরাজিত করে যেখানে জীবনানন্দের কবিতায় লাস-কাটা ঘরের ক্লান্তিকর হাতছানিই প্রবল হয়ে উঠেছে, সেখানে 'ভিখারী ও সেনাপতি শব হয়' জেনেও রামেন্দ্র দেশমুখ্য উচ্চারণ করতে পেরেছেন— 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়'।" প্রাথমিকভাবে এই সমালোচনাটি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বলে জানা যায়নি তবে জীবনানন্দের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় এই সমালোচনার লেখক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
৫। রুদ্র সুব্রত (সম্পাদক), জীবনানন্দ: জীবন আর সৃষ্টি, কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, ১৯৬০ পৃ. ৩৮২ – ৩৮৩
৬। সৈয়দ আবদুল মান্নান, *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ*, ঢাকা: অবসর, ২০০৫ পৃ. ২০৭
৭। কবি-কল্পনা ও কাব্য সৃজনে এলিয়ট (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রদর্শিত দিকগুলি সম্পর্কে বিশ শতকের প্রথমার্ধের কবিরা সচেতন হয়েছিলেন এবং তাঁদের সৃষ্টি ও ভাবনায় এলিয়টের ভাবনার রেখাপাত ঘটেছিল এই চিন্তাসাদৃশ্য বোঝানোর জন্য জীবনানন্দের এই বক্তব্যের সঙ্গে এলিয়টের 'Traditional and Individual Talent' প্রবন্ধের যে অংশটি ব্যবহার করা হয় তা হল— "This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional."
৮। ভট্টাচার্য সঞ্জয়, *কবি জীবনানন্দ*, কলকাতা: ভারবি, ২০১৪ পৃ. ৭৪
৯। J B Leishman, Ranier Marina Rilke pp73

১০। ঘোষ শঙ্খ (সম্পাদক), এই সময় ও জীবনানন্দ, কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭ পৃ. ০৮

Bibliography:

১। ঘোষ শঙ্খ (সম্পা.), এই সময় ও জীবনানন্দ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১
২। চট্টোপাধ্যায় তীর্থঙ্কর (সম্পা.), একদিন শতাব্দীর শেষে জীবনানন্দ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, মার্চ ২০০০
৩। দাশগুপ্ত অলোকরঞ্জন, জীবনানন্দ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭
৪। দাস প্রভাতকুমার, জীবনানন্দ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
৫। বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৮
৬। ভট্টাচার্য সঞ্জয়, *কবি জীবনানন্দ*, কলকাতা: ভারবি, ২০১৪ পৃ. ৭৪
৭। Seely Clinton B., A Poet Apart, Associated University Presses, London & Toronto, 1990

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। কবি, প্রাবন্ধিক। মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস) থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন। সেখান থেকে স্নাতকোত্তর ও এমফিল স্তরের গবেষণার পর বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির থেকে পিএইচডি গবেষণা করছেন। তাঁর গবেষণাচর্চার অন্যতম ক্ষেত্র হল জীবনানন্দ দাশ।

CC BY NC